ওষুধ দিবস ... ৩
ম্যালেরিয়া ... ৪
পানি বিশুদ্ধকরণ ... ৬
উচ্চ রক্তচাপ ... ৮

ISSN 1021-2078

স্বাস্থ্য সংলাপ

ICDDR,B
CENTRE FOR HEALTH AND POPULATION RESEARCH
আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

বর্ষ ৪ সংখ্যা ১ বৈশাখ ১৪০২

ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া

ডাঃ অমল কুমার মিত্র

শীতের মৌসুমে কিছু-কিছু রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। এরকম একটি রোগ হচ্ছে ভাইরাসজনিত ডায়রিয়া। ভাইরাস এক প্রকারের অতি ছোট জীবাণু, যা খালি চোখে তো নয়ই, সাধারণ মল পরীক্ষায়ও ধরা পড়ে না। বিশেষ পরীক্ষার মাধ্যমে এই ভাইরাস সনাক্ত করা যায়। তবে রোগ চিনতে অসুবিধা হয় না। একজন মাও চিনতে পারেন তার শিশুর "দুধ হাগা" হয়েছে কি না। পানি ও দই মিশালে যে-রকম দেখা যায়, পায়খানার ধরন তার সাথে তুলনা করা যায়। পায়খানা কখনো সাদা, আবার কখনো সবুজ রং-এর হয়, পানির ওপর মল ভেসে থাকে ও পায়খানা পানির মতো পাতলা—এই হলো এরোগের লক্ষণ।

শিশুদের ভাইরাস-ডায়রিয়া বেশি হয়। বুকের দুধের সাথে শিশু যখন একটু-আধটু নূতন খাবার খেতে শুরু করে, সেই বয়সে এ ডায়রিয়া শুরু হয়। অনেকে ভেবে থাকেন, মার দুধে রোগ আছে, এই দুধ হয়তো বাচ্চার সহ্য হচ্ছে না। এরকম ধারণা সঠিক নয়। এরকম ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করে দেয়া কিছুতেই ঠিক নয়। আবার অনেকে শিশুর দাঁত-ওঠার সাথে ঘনঘন পায়খানা হওয়ার সম্পর্কের কথা বলে থাকেন। দাঁত-ওঠার বয়সে এধরনের ডায়রিয়া হতে পারে, তাই বলে দাঁত-ওঠা রোগের কোনো কারণ নয়। অতএব আমরা যে ভাইরাস-ডায়রিয়ার কথা বলছি, তা মূলতঃ ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত বয়সের শিশুদের আক্রমণ করে। ৯ মাস থেকে ১ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের এ ডায়রিয়া সবচেয়ে বেশি দেখা যায়।

যেকোনো ভাইরাস রোগের কিছু প্রাথমিক উপসর্গ থাকে, যেমন জ্বর, কাশি ও বমি। ২ থেকে ৩ দিন যেতে না যেতেই শুরু হয় পাতলা পায়খানা। অতএব শিশুর যদি প্রথমে বমি এবং পরে পায়খানা এবং পায়খানার লক্ষণ যদি দই মেশানো পানির মতো হয়, তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাইরাস-ডায়রিয়া হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

পায়খানা চলাকালেও জ্বর ও বমি হতে পারে। তবে জ্বর ১০২° ফাঃ-এর বেশি হয় না বললেই চলে। ঘনঘন পায়খানা করার ফলে শিশুর শরীরে পানিস্বল্পতার লক্ষণ দেখা যায়। ডায়রিয়া যে কারণেই হোকনা

(২য় পৃঃ দ্রষ্টব্য)

জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন কর্মসূচি ঃ সিরিঞ্জ-সূঁচ ধ্বংসকরণ

মোঃ হুমায়ুন কবির

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়া বিভিন্নভাবে ঘটে থাকে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও দ্রুত জনসংখ্যা বেড়ে যাবার কারণে পরিবেশ ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে। এই দূষণ প্রক্রিয়া সৃষ্টিকারী বস্তুপূঞ্জ গাড়ি বা কল-কারখানার কালো ধোঁয়া থেকে শুরু করে কৃষিক্ষেতে ব্যবহৃত সার, কীটনাশক ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য জৈব পদার্থ, স্বাস্থ্য ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী পর্যন্ত বিস্তৃত। আমরা যদি বাংলাদেশের যে-কোনো সাধারণ হাসপাতালের দিকে তাকাই তাহলে যে চিত্রটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় পরিবেশকে আমরা কিভাবে ও কতটা দূষিত করছি।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ইনজেকশন কর্মসূচিতে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচ দিয়ে ইনজেকশন দেয়া হয়। ব্যবহৃত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচ ধ্বংসকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ এসবের পুনঃব্যবহার নানারকম মারাত্মক ব্যাধির প্রসার ঘটাতে পারে। আবার সঠিকভাবে

(৫ম পৃঃ দ্রষ্টব্য)

বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন

সংলাপ রিপোর্ট

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি)-এর দু'দিনব্যাপী চতুর্থ বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো গত ২১ ও ২২ জানুয়ারী। কেন্দ্রের সাসাকাওয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন আইসিডিডিআর,বি-এর পরিচালক অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে। বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) ও দাতা সংস্থার ১৫৬ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ঢাকাস্থ ইউএসএইড-এর ডেপুটি মিশন ডাইরেক্টর মিস লিজা চাইলস্, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএনএফপি-এর মিঃ এলাইন পি মুশিরুদ, সম্মেলনের আহবায়ক ডঃ রাধেশ্যাম বৈরাগী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন বিখ্যাত জনসংখ্যাবিদ রকফেলার ফাউন্ডেশনের পপুলেশন সায়েন্স ডিভিশনের পরিচালক ডঃ স্টিভেন ডব্লিউ সিনডিং। এবছরের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল ঃ "Health Policy Challenges: Population and Cholera"। দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে আইসিডিডিআর,বি-এর বিজ্ঞানীগণসহ আগত বিজ্ঞানীগণ জনসংখ্যা এবং কলেরা-বিষয়ক তথ্যবহুল বিভিন্ন প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

ভাইরাস ডায়রিয়া

(১ম পৃঃ পর)

কেন, পায়খানার পরিমাণ বেশি হলে এবং ঘনঘন পায়খানা হলে শিশুর মাথার চাঁদী বসে যায়, চোখে পানি দেখা যায় না, শিশুর পিপাসা বেড়ে যায়, তার শ্বাসের গতি বেড়ে যায়, গায়ের চামড়া ঢিলে হয়ে আসে, প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায়। এরকম নানা লক্ষণ দেখা যায়। এসমস্ত লক্ষণ যতো বেশি স্পষ্ট হয়ে দেখা যাবে, শিশুর শরীরে পানিস্বল্পতা ততো বেড়ে গেছে বুঝতে হবে।

পানিস্বল্পতার লক্ষণ দেখা দেয়ার আগে থেকে তা প্রতিরোধ করা যায়। শিশুর ডায়রিয়া শুরু হবার সাথে-সাথে যদি তাকে খাবার স্যালাইন

খাওয়ানো হয় এবং সাথে যদি বুকের দুধ বা শিশুর স্বাভাবিক খাবার দেয়া হয়, তাহলে পানিস্বল্পতা সৃষ্টি হতে পারে না। বমি হয় বলে খাবার স্যালাইন বন্ধ করা ঠিক নয়। প্রতিবারে অল্প মাত্রায় ঘনঘন স্যালাইন খাওয়ালে বমি ধীরে-ধীরে কমে আসবে। শিশুর প্রস্রাবের পরিমাণ স্বাভাবিক আছে কি না তা খেয়াল রাখতে হবে। প্রস্রাব কমে গেলে পানিস্বল্পতা বেশি বুঝতে হবে। এসব ক্ষেত্রে ঘরে চিকিৎসা না করাই ভালো। আরো কিছু লক্ষণের কথা বলা যায় যা হলে শিশুর অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মতো বা হাসপাতালে চিকিৎসা করা দরকার। এ লক্ষণগুলো যেকোনো ডায়রিয়ার বেলায় সত্যি। লক্ষণগুলো হচ্ছে: পেট ফেঁপে-যাওয়া, অতিরিক্ত বমি বা জ্বর বেশি হওয়া। ভাইরাস-ডায়রিয়ার এগুলো নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নয় অর্থাৎ অন্য ধরনের ডায়রিয়াতেও এ লক্ষণগুলো দেখা দিতে পারে। এ লক্ষণগুলো ছাড়াও বারবার পায়খানা করার ফলে শিশুর মলদ্বারের এবং আশেপাশের চামড়া লাল হয়ে উঠতে পারে। এটা কোনো মারাত্মক উপসর্গ নয়।

ভাইরাস-ডায়রিয়ার চিকিৎসায় বিশেষ কোনো ওষুধ নেই। খাবার স্যালাইন এবং প্রয়োজনবোধে শিরায় স্যালাইন দিয়ে পানিস্বল্পতা পূরণ করাই হচ্ছে মূল চিকিৎসা। তবে শিশুর খাওয়া-দাওয়া ঠিকভাবে না হলে পরবর্তীকালে শিশু অপুষ্টির শিকার হতে পারে। কত দিনে এ-ডায়রিয়া ভাল হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেয়া খুব কঠিন। তবে সাধারণতঃ ৭ থেকে ৮ দিনের মধ্যেই শিশু ভাল হয়ে যেতে পারে।

বিশ্ব এইডস দিবস পালিত

এইডস প্রতিরোধে চাই পারিবারিক সহযোগিতা

সংলাপ রিপোর্ট

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও গত পহেলা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালিত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "AIDS and the Family : Families Take Care" অর্থাৎ এইডস পরিচর্যায় চাই পারিবারিক সহযোগিতা। বিশ্ব এইডস দিবস পালন উপলক্ষে জাতীয় এইডস কমিটি ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এইডস ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এইডস-বিষয়ক সচেতনতা কমিটি, আইসিডিডিআর,বি, ভিএইচএসএসসহ বহু প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এইডস প্রতিরোধ-বিষয়ক আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, র‍্যালী, পোস্টার প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করে। বর্তমানে সারা বিশ্বে মহামারী আকারে ঘাতকব্যাধি এইডস ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক এইডস ভাইরাস-এর সংক্রমণের শিকার। তন্মধ্যে ৪০ লক্ষ এইডস রোগী রয়েছে এবং ১০ লক্ষ এইডস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটেছে। সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বে ১০ লক্ষ শিশু এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত। এরা সবাই গর্ভাবস্থায় এইডস ভাইরাস-এর সংক্রমণের শিকার হয়। শুধু আফ্রিকাতেই ১৯৯৩ সালে এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত ৭ লক্ষ মহিলা সন্তান প্রসব করে। শুধু আফ্রিকা বা আমেরিকা নয়, এশিয়ায় তথা দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে এইডস ভাইরাস-এ আক্রান্তের হার দ্রুত বাড়ছে। ভারত ও থাইল্যান্ডে ইতোমধ্যে লক্ষ-লক্ষ লোক আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সবদেশেই কমবেশি এই রোগের সংক্রমণ শুরু হয়েছে। ১৯৯৪ সাল

পারিবারিক সংস্পর্শে এইডস্ ছড়ায় না– আচার ব্যবহার আগের মতই স্বাভাবিক হওয়াই ভাল।

পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩৪ জন লোক এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত বলে জাতীয় এইডস কমিটি খবর দিয়েছে। তবে বাংলাদেশে প্রকৃতপক্ষে কত লোক এইডস নামক এই ঘাতকব্যাধির জীবাণু বহন করছে তা বলা কঠিন, কারণ বেশিরভাগ রোগীকেই বিদেশে চিহ্নিত হওয়ার পর দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

মহাখালীস্থ রোগতত্ত্ব ও রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (IEDCR) সূত্রের তথ্য মতে জাতীয় এইডস কমিটির সহায়তায় দেশে এপর্যন্ত দেড় লক্ষাধিক লোকের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। যাদের রক্ত পরীক্ষা করা হয় তাদের মধ্যে পতিতা, পেশাগত রক্তদাতা, মাদকসেবী, ট্রাক ড্রাইভার, রিকশাচালক ও ভবঘুরে আশ্রয় কেন্দ্রে আশ্রিতার সংখ্যা প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ ভাগ। তবে এখন কিছু-কিছু লোক এইডসমুক্ত কি না তা পরীক্ষা করার জন্য নিজেরাই বিভিন্ন ল্যাবরেটরীর সাহায্য নিচ্ছে। আইইডিসিআর-এর একজন সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে বাংলাদেশে দেড় লক্ষাধিক পরীক্ষিত নমুনার মধ্যে যদি ৩৪ জন লোকের রক্তে এইডস-এর জীবাণু HIV সনাক্ত হয় তবে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মধ্যে আনুমানিক অন্ততঃ ১৫ থেকে ২০ হাজার লোক এইডস-এর ভাইরাস বহনকারী হওয়ার কথা। তবে এই পরিসংখ্যানের কোনো তথ্য জাতীয় এইডস কমিটি কর্তৃক স্বীকৃত নয়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এইডস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় বাংলাদেশকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সবচাইতে উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে, শরীরে এইডস-এর জীবাণু সংক্রমিত হওয়ার পর ৮ থেকে ১০ বছর অথবা তার চেয়ে বেশি সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ নাও পেতে পারে এবং এই মরণব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীগণ আজ অবধি কোনো টিকা আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি। এছাড়া এই রোগের কোনো চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত হলে মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং প্রতিরোধই একমাত্র উপায়। তাই এরোগ সম্পর্কে কতিপয় তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে:

এইডস ভাইরাস কিভাবে শরীরে প্রবেশ করে

- এইডস ভাইরাস (HIV)-আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে যৌন মিলনের মাধ্যমে
- আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বা রক্তসামগ্রী পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে
- সংক্রমিত ইনজেকশনের সূঁচ, সিরিঞ্জ ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে এবং দন্ত চিকিৎসায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির মাধ্যমে
- আক্রান্ত গর্ভবতী মা থেকে শিশুর শরীরে।

কিভাবে ভাইরাস ছড়ায় না

- দৈনন্দিন সামাজিক মেলামেশা ও চলাফেরার মাধ্যমে (করমর্দন, এক সাথে আহার)
- পোষাক-পরিচ্ছদ বা আসবাবপত্রের মাধ্যমে
- পানি, খাদ্য, বাতাস, হাঁচি ও কাশি, থুথু, মল-মূত্র ইত্যাদির মাধ্যমে
- মশা ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের কামড়ের মাধ্যমে।

এইডসমুক্ত থাকার উপায়

- অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং অস্বাভাবিক যৌনাচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত থাকতে হবে
- পতিতালয় অথবা অপরিচিত মেয়েদের সাথে কোনো প্রকার যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না
- একাকী বিদেশে অবস্থানকালে সংযম রক্ষা করা অর্থাৎ যৌন সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা
- বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত ও আস্থাবান হতে হবে
- চিকিৎসার জন্য রক্ত বা রক্তজাত উপাদান পরিসঞ্চালনের আগে রক্তে এইডস ভাইরাস আছে কি না তা পরীক্ষা করে নিতে হবে
- বারবার ব্যবহৃত সিরিঞ্জ বা সূঁচ ব্যবহারের আগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে (ফুটিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে) জীবাণুমুক্ত করতে হবে। ডিসপোজেবল (মাত্র একবার ব্যবহারযোগ্য) সিরিঞ্জ ব্যবহার করা সবচাইতে নিরাপদ
- রক্তনালীতে নেশাজাতীয় ঔষধ গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে
- অনাকাংক্ষিত যৌন সংস্পর্শ এড়ানো না গেলে অবশ্যই উন্নতমানের কনডম সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে হবে।

আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য পারিবারিক সহযোগিতা

আমরা পূর্বেই বলেছি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী বর্তমানে সারা বিশ্বে ১ কোটি ৭০ লক্ষ লোক এইডস-এর জীবাণু বহন করছে। তন্মধ্যে লক্ষ-লক্ষ মহিলা ও শিশু রয়েছে। তাছাড়া একজন আক্রান্ত ব্যক্তি ৮ থেকে ১০ বছর বা আরও বেশি সময় পর্যন্ত কর্মমুখর জীবনযাপন করতে পারেন। পারিবারিক সংস্পর্শে সহঅবস্থান (সাধারণ মেলামেশায়), করমর্দন অথবা এইডস রোগীর বিছানায় অবস্থান করলেও অন্যের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাই বিশ্বব্যাপী এখন এইডস আক্রান্তদের পারিবারিক পর্যায়ে পরিচর্যার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। পরিবারের অন্যান্য সদস্যের মতই তাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে। আক্রান্ত ব্যক্তি বিবাহিত বা অবিবাহিত হলে তিনি যাতে শারীরিক মেলামেশা না করেন অথবা অন্য কোথাও শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন না করেন তার জন্য তাকে পরিবারের মুরুব্বীগণ অথবা স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্র নিয়মিত পরামর্শ দিবে। এছাড়া চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করার ব্যাপারে পরিবারের অন্য সদস্যগণ ভূমিকা রাখবেন। আক্রান্ত ব্যক্তি যে বয়সেরই হোক না কেন তাকে সহানুভূতি দেখানো হচ্ছে এমন ভাব যেন কোনো অবস্থায় প্রকাশ না পায়। বরং তার সাথে আগের মতই স্বাভাবিক কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহার করতে হবে।

ম্যালেরিয়া

ডঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম

মশার কথা উঠলে সবসময় ম্যালেরিয়ার কথা আলোচিত হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে সব ধরনের মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া রোগ হয় না। আবার ম্যালেরিয়া রোগ নিয়েও নানা ভয়-ভীতি রয়েছে। অথচ ম্যালেরিয়া কোনো ভয়ংকর রোগ নয়। এটি সহজে প্রতিরোধ ও নিরাময়যোগ্য একটি রোগ। তবে উদ্বেগজনক ব্যাপার হচ্ছে সময়মত ম্যালেরিয়া রোগ সনাক্ত ও এর চিকিৎসা না করলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রতিবছর সারা বিশ্বে ১১ কোটি (১১০ মিলিয়ন) লোক ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। তন্মধ্যে ৯ কোটি রোগী হচ্ছে আফ্রিকা ও সাহারার দক্ষিণাঞ্চলের। এদের বেশিরভাগই ৫ বছরের কম-বয়সী শিশু। বাংলাদেশেও ম্যালেরিয়া রোগের কম-বেশি প্রাদুর্ভাব রয়েছে। আগে ধারণা করা হত শুধুমাত্র বন-জঙ্গল, পাহাড়ী এলাকা, সিলেট, সুনামগঞ্জ ও নেত্রকোনাসহ কয়েকটি এলাকা ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু এখন এই ধারণা বদলে গিয়েছে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন সমতল অঞ্চলেও কম-বেশি ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী সারা দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে দেড় লক্ষ লোকের ম্যালেরিয়া সনাক্ত হয়। তন্মধ্যে প্রতি বছর ৫ থেকে ৬ শত লোক মারা যায়। তবে ধারণা করা হয়, আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা এর চেয়েও কয়েকগুণ বেশি।

ম্যালেরিয়া রোগ কি?

ম্যালেরিয়া হচ্ছে এক ধরনের সংক্রামক ব্যাধি। ম্যালেরিয়া জীবাণুবাহী স্ত্রী এনোফিলিস মশা কোনো সুস্থ লোককে কামড়ালে ম্যালেরিয়া রোগ হয়। রোগতত্ত্ববিদদের মতে এনোফিলিস মশার চারশত প্রজাতি রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র ৭০টি প্রজাতি ম্যালেরিয়া-বাহক হিসেবে পরিচিত। আর ৪টি প্রজাতির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায় ম্যালেরিয়া পরজীবী। এগুলো হচ্ছে:

১. প্লাসমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স (বেনাইন টার্সিয়ান ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী)
২. প্লাসমোডিয়াম ওভালি (ওভাল ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী)
৩. প্লাসমোডিয়াম ম্যালেরি (কোয়ার্টান ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী)
৪. প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (ম্যালিগন্যান্ট টার্সিয়ান ও সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার জন্য দায়ী)।

আবার এনোফিলিস স্ত্রী মশার মধ্যে এনোফিলিস ফিলিপিনিনসিস সমতল ভূমি এলাকায় ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায়। এনোফিলিস সানডিকা সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ ঘটায়। এনোফিলিস মিনিমাস পার্বত্য অঞ্চলে এবং এনোফিলিস বালবাসেনসিস পার্বত্য জংগল এলাকায় ম্যালেরিয়া রোগ ছড়ায়।

ম্যালেরিয়া রোগের লক্ষণ

ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশের ৯ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে। তবে সাধারণতঃ ১২ দিনের মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এ সময়টাকে রোগের সুপ্তাবস্থা বলা হয়। ম্যালেরিয়ার প্রকারভেদে রোগের লক্ষণসমূহের কিছুটা তারতম্য রয়েছে। তবে সাধারণ কিছু লক্ষণ রয়েছে যেমনঃ শরীরে জ্বর, দুর্বলতা, হঠাৎ করে শরীর-কেঁপে জ্বর-আসা, তীব্র মাথাব্যথা, মাংসপেশীর ব্যথা ইত্যাদি। অনেক সময় শরীর-কেঁপে জ্বর-আসার সময় শরীরে প্রচন্ড ঝাঁকুনি শুরু হয়, অনেকটা খিচুনি উঠার মত। জ্বর ও কাঁপুনি ২০ মিনিট থেকে ১ ঘন্টা পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। পরে জ্বর কমতে থাকে এবং শরীর-ঘামা শুরু হয়। শরীরের তাপমাত্রা ১০০ থেকে ১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত উঠতে পারে। অনেক সময় রোগের লক্ষণ ভাইরাস জ্বর অথবা ইনফ্লুয়েঞ্জা থেকে আলাদা করা যায় না। তবে ম্যালেরিয়া রোগের মধ্যে সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া সবচাইতে মারাত্মক। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ায় রোগের দ্রুত অবনতি হতে থাকে, রোগী হঠাৎ অচেতন হয়ে পরে প্রলাপ বকতে থাকে। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার অনেক বেশি। এই ম্যালেরিয়ায় প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জন রোগীর মৃত্যু ঘটে। শিশুদের ক্ষেত্রে দ্রুত অবনতি ঘটে। সেরিব্রাল ম্যালেরিয়ার রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নেয়া উচিত। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর শীতবোধ অত্যন্ত বেশি থাকে। ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে কখনই রুটিন মাফিক জ্বর আসে না। অনেক ম্যালেরিয়ার জন্য রোগীর প্লীহা (Spleen) বড় হয়ে যায়।

রোগ নিরূপণ

সাধারণতঃ চিকিৎসকগণ রোগের লক্ষণ ও জ্বরের অবস্থা দেখে প্রাথমিক অবস্থায় ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে থাকেন। কিন্তু রোগীর রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া গেলে নিশ্চিতভাবে ম্যালেরিয়া বলা হয়। সবসময় রক্ত পরীক্ষায় ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে চিকিৎসকগণ শুধুমাত্র রোগের লক্ষণ দেখে চিকিৎসা করে থাকেন।

চিকিৎসা

ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। ক্লোরোকুইন সারা বিশ্বে আজও ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার সবচাইতে কার্যকর ওষুধ বলে পরিচিত। মূলতঃ ১৮২০ সালে ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসেবে কুইনিনের ব্যবহার শুরু হয়। তবে ক্লোরোকুইন নামের এই ওষুধ ইদানীং অনেকক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে গিয়েছে অর্থাৎ এই ওষুধ খেলে আর ম্যালেরিয়া সারে না। ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট ও সিরাপ উভয় আকারে পাওয়া যায়, ফলে যেকোনো বয়সে এটা ব্যবহার করা যায়। ক্লোরোকুইনে কাজ না হলে বিকল্প ওষুধ হিসেবে সালফাডক্সিন পাইরিমিথামিন অত্যন্ত কার্যকর। কিন্তু নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যায় না। তবে ক্লোরোকুইন ও সালফাডক্সিন পাইরিমিথামিন যেখানে কার্যকর নয় সেখানে কুইনিন ব্যবহার করা হয়। সাধারণভাবে ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা নিম্নোক্ত উপায়ে করা হয়ঃ

- রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হবে।
- জ্বরের জন্য খাবার পর অর্থাৎ ভরা-পেটে প্যারাসিটামল খেতে হবে।
- সাধারণ ম্যালেরিয়ার জন্য ট্যাবলেট ক্লোরোকুইন ১৫০ মিঃগ্রাঃ-এর ৪টি এক সঙ্গে খেতে হবে। ৬ ঘন্টা পর আরও ২টি বড়ি এক সঙ্গে এবং পরে প্রতিদিন ১২ ঘন্টা পরপর ২টি করে বড়ি এক সঙ্গে ৩ দিন খেতে হবে।
- শরীর থেকে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বিনাশ করার জন্য প্রাইমিকুইন ১টি করে ১২ ঘন্টা পরপর ১৪ দিন খেতে হবে।

- উপরোক্ত চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ সম্ভব না হলে ফ্যানসিডার বড়ি ৩টি এক সঙ্গে রাতে শোবার সময় খেতে হবে। এক সপ্তাহ পর পুনরায় সেবন করা যেতে পারে।
- ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার জন্য প্রয়োজন হলে ইনজেকশন ক্লোরোকুইন মাংসপেশীতে প্রয়োগ করতে হবে।
- রোগীকে পানি দিয়ে শরীর মুছিয়ে দিতে হবে।
- রোগীকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও খাবার দিতে হবে।

প্রতিরোধ ও প্রতিকার

সাধারণতঃ মশা নিয়ন্ত্রণই ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধের একমাত্র কার্যকর পন্থা। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য বাড়ির আশেপাশের ঝোপঝাড় ও নালা-ডোবা পরিষ্কার রাখতে হবে এবং সন্ধ্যার পর মশার প্রজনন স্থানে ডিডিটি বা অন্য কোনো কীটনাশক ছিটাতে হবে। এর পাশাপাশি মশারী টানিয়ে শোয়ার অভ্যাস করতে হবে। মনে রাখতে হবেঃ ম্যালেরিয়ার কোনো প্রতিষেধক (টিকা) নেই, প্রতিরোধই এর একমাত্র ব্যবস্থা।

সিরিঞ্জ-সূঁচ ধ্বংসকরণ

(১ম পৃঃ পর)

ধ্বংস করা না হলে এই সিরিঞ্জ ও সূঁচ পরিবেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর থেকে ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ধ্বংসকরণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বিধি-নিষেধ প্রকাশ করা হয়েছে। এ সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও সেগুলোর সমাধান সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হলোঃ

প্রশ্ন

- কেন ব্যবহৃত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জগুলো ধ্বংস করা দরকার?
- কোথায় ধ্বংস করতে হবে?
- কিভাবে ধ্বংস করতে হবে?
- ধ্বংস প্রক্রিয়ার কাজটি কে কে করবে?
- ধ্বংস-সংক্রান্ত তথ্য কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে?

উত্তর

১. ব্যবহৃত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচ সার্বিকভাবে এবং নিয়মিত ধ্বংস করা না হলে স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচের পুনঃব্যবহার হেপাটাইটিস বি (জন্ডিস) ও এইডস-এর মত মারাত্মক রোগের সংক্রমণ ঘটাতে পারে। এধরনের জটিলতা জনমনে কর্মসূচি সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এগুলো পুনঃব্যবহারের ফলে শরীরের কোথাও, বিশেষ করে হাতের আঙ্গুলে, খোঁচা লাগার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ঐসব জটিলতা কর্মীর নিজের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। তাই ব্যবহৃত সিরিঞ্জ ও সূঁচ ধ্বংস করা একান্ত অপরিহার্য।

২. তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ব্যবহৃত ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ ও সূঁচগুলো ধ্বংসের জন্য থানা গুদামে ফেরত দেয়া কষ্টকর। এই অসুবিধার কথা ভেবে নিম্নে উল্লিখিত স্থানে ধ্বংসকরণের কাজটি সমাধা করার জন্য বলা হয়েছেঃ

ক. পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র
খ. মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র
গ. থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র

৩. ধ্বংস করার জন্য আবশ্যিকভাবে যে নিয়ম-নীতি গ্রহণ ও অনুসরণ করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপঃ

পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বা মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র অথবা মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইউনিট অর্থাৎ থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পিছনে বা সম্ভাব্য সুবিধাজনক স্থানে এক হাত দীর্ঘ, এক হাত প্রশস্ত এবং দু'হাত গভীর একটি গর্ত করে তিন মাসের জমানো ব্যবহৃত সিরিঞ্জগুলো পোড়াতে হবে। এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে কেন প্রতিমাসে ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়ার কাজটি ঘটছে না? যদি প্রতিমাসে ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়ার কাজটি ঘটে সেক্ষেত্রে ১২ মাসে ১২টি গর্ত করতে হবে, ফলে ২-৩ বছরের মধ্যে কেন্দ্রের কোথাও গর্ত করার মত জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই তিন মাস অন্তর-অন্তর এই কাজটি সমাধা করলে ঐ সমস্যা থেকে কিছুটা পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব হবে।

৪. ধ্বংসকরণ কাজটি তখনই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে যখন এই প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। এই কাজের সাথে কেন্দ্রের কর্মকর্তা ও পরিদর্শকদের সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

ক. **পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র:** পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক ও চিকিৎসা সহকারী

খ. **মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র:** পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও মেডিক্যাল অফিসার

গ. **থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র:** পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা, থানা পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, মেডিক্যাল অফিসার, সিনিয়র পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা ও সহকারী পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার মধ্য থেকে যেকোনো তিনজন কর্মকর্তা।

৫. ধ্বংস-সংক্রান্ত প্রতিবেদন: কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের

জন্য তথ্যের সংরক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। কতগুলো সিরিঞ্জ ও সূঁচ তিনমাসে ধ্বংস করা হচ্ছে এব্যাপারে প্রতিবেদন তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করা কর্মসূচির মূল্যায়নের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ধ্বংসকরণ-সংক্রান্ত প্রতিবেদনের একটি কপি ইউনিয়ন, মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র বা মা ও শিশু স্বাস্থ্য ইউনিট থেকে থানায় প্রেরণ করতে হবে এবং এক কপি করে ঐসব কেন্দ্রসমূহে সংরক্ষণ করতে হবে। ঐসব কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদনসমূহ থানার প্রতিবেদনে সংকলিত হবে। ঐ সংকলিত কপি মেডিক্যাল অফিসার এবং থানা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত একটি করে কপি অতিরিক্ত পরিচালক (ডিএণ্ডএস), প্রকল্প পরিচালক (ক্লিনিক্যাল সার্ভিসেস), উপ-পরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা) ও জেলা সংরক্ষিত পণ্যাগারের সরবরাহ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ এবং একটি কপি থানায় সংরক্ষণ করতে হবে।

উপসংহার

সুস্থ পরিবেশ ও সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে ব্যবহৃত ডিসপোজেবল সামগ্রীসমূহ ধ্বংসকরণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা উচিত—যার ফলশ্রুতিতে ধ্বংসকরণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। পৌরসভা এলাকায়, শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়ার জন্য নিম্নে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। পৌর এলাকায় বা শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে গর্ত করে সিরিঞ্জ ও সূঁচ ধ্বংস করা সম্ভব নয়।

- পৌর এলাকায়, শহরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে একটি ইনসিনারেটর তৈরি করা উচিত। কেন্দ্রসমূহের কর্মকর্তাগণই ধ্বংসকরণ প্রক্রিয়ার কাজটি সমাধা করবেন।
- কেন্দ্রসমূহের ধ্বংসকরণ কাজটি প্রতি তিন বা চার মাস অন্তর-অন্তর হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর-অন্তর পরিবীক্ষণ হওয়া দরকার।

এখানে উল্লেখ্য যে অভয়নগর থানা স্বাস্থ্য প্রকল্পে একটি ইনসিনারেটর তৈরি করা হয়েছে যাতে যৌথভাবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আইসিডিডিআর,বি'র এমসিএইচ-এফপি-এর ধ্যান-ধারণার অংশবিশেষ প্রতিফলিত হয়েছে।

জেনে রাখা ভালো

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

৬. দুপুরের খাবারের পর সম্ভব হলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবেন
৭. প্রত্যহ ৬ ঘন্টা ঘুমাবেন
৮. শরীরের বাড়তি ওজন কমাবেন
৯. নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দিলে আপনার চিকিৎসককে জানাবেন

নিষেধ

১. চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত ঔষধ বন্ধ করবেন না বা ঔষধের ডোজ কমাবেন না বা বাড়াবেন না
২. দুঃশ্চিন্তা যতদুর সম্ভব এড়িয়ে চলুন
৩. শরীরের ওজন বাড়াবেন না
৪. উত্তেজিত হবেন না
৫. অতিরিক্ত পরিশ্রম করবেন না

খাবেন

১. সয়াবিন তেলের রান্না
২. বেশি করে শাক-সব্জী, ফল, সালাদ
৩. মুরগির মাংশ [চামড়া, কলিজা বাদে]
৪. মাছ
৫. ডাল, ভাত, রুটি, হালকা চা

খাবেন না

১. গরুর মাংস, খাসির মাংস
২. চিংড়ি মাছ
৩. কলিজা, মগজ
৪. নারিকেল
৫. ঘি, মাখন, চর্বি, বাটার ওয়েল, ডিম [বিশেষ করে কুসুম], পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, সর, দুধের তৈরী খাবার
৬. আলগা লবণ, বেশি লবণযুক্ত খাবার
৭. বিড়ি-সিগারেট, তামাক পাতা, জর্দা, গুল
৮. মাদক দ্রব্য

(৭ম পৃঃ দ্রষ্টব্য)

আপনার শিশুকে টিকা দিন

আপনি জানেন কি

হামের টিকা শিশুর ডায়রিয়া প্রতিরোধে সহায়ক

৯ মাস বয়স হয়ে গেলেই

শিশুকে হামের টিকা দিন

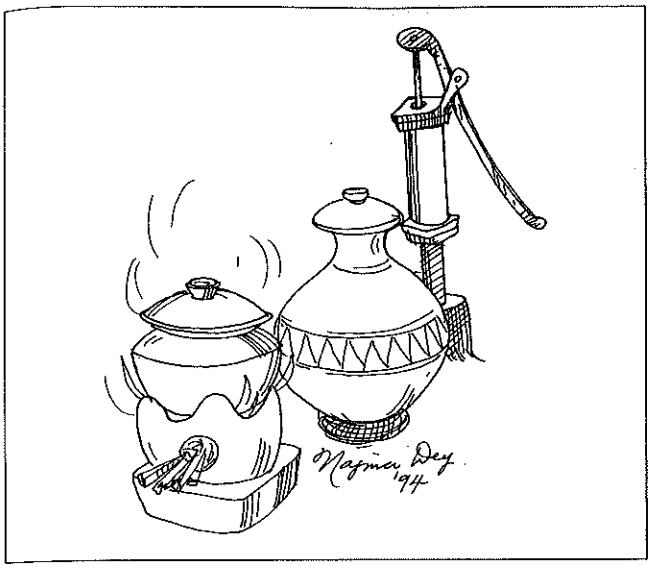

(৬ষ্ঠ পৃঃ পর)

৩. পানি বিশুদ্ধকরণের সহজ পদ্ধতি

টিউবওয়েলের পানি যদি পাওয়া না যায়, তবে নিচের যেকোনো একটি উপায়ে নদী অথবা পুকুরের পানি বিশুদ্ধ করে পান করুন :

ফুটিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ

— পুকুর বা নদীর পানি টগবগিয়ে ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করুন

পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেটের ব্যবহার

— যেসব ট্যাবলেট সহজে গলে না অথবা যেসব ট্যাবলেটের রং জ্বলে গিয়েছে সেসব ট্যাবলেট ব্যবহার করবেন না

— একটি পাত্রে নির্দেশিত পরিমাণ পানির মধ্যে ট্যাবলেট গুলিয়ে নিন

— ট্যাবলেট গুলানোর নির্দেশিত সময়ের পর পানি ব্যবহার করুন

ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ

— পাউডার অবশ্যই টাটকা, সাদা, ঝরঝরে শুকনা হতে হবে এবং এতে তীব্র ক্লোরিনের গন্ধ থাকতে হবে

— ২৫ সের পানির মধ্যে এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ (৬০০ মিলিগ্রাম) ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ভাল করে মিশিয়ে নিন

— ৩০ মিনিট পর পাউডার মেশানো পানি ব্যবহারযোগ্য হবে

— বিশোধিত পানির রং স্বচ্ছ না হলেও তা পান করা নিরাপদ

— পরিশোধিত পানিতে ক্লোরিনের গন্ধ থাকবে

ফিটকিরি দিয়ে পানি বিশুদ্ধকরণ

— ২৫ সের পানিতে ২ চা চামচ গুড়া ফিটকিরি ভালভাবে মিশিয়ে নিন

— কমপক্ষে এক ঘন্টা পর পানির পাত্র না নেড়ে ওপর থেকে পরিষ্কার পানি অন্য পাত্রে আলতোভাবে ঢেলে নিন এবং নিচের তলানি ফেলে দিন

— বিশুদ্ধ পানি একটু কষকষ লাগতে পারে। বিশুদ্ধ পানির সাথে অন্য কোনো পানি মেশাবেন না

স্বাস্থ্য কুইজ-১১ এর উত্তর

১. যক্ষ্মা, হাম, পোলিও, হুপিং কাশি, টিটেনাস ও ডিপথেরিয়া। দেড়মাস বয়সের সময়ে ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও টিটেনাসের টিকা ও পোলিওর টিকার ১ম ডোজ দেয়া হয়। এর একমাস পরে ২য় ডোজ এবং ২য় ডোজের ১ মাস পরে ৩য় ডোজ টিকা নিতে হয়। জন্মের পর থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত যক্ষ্মার টিকা দেয়া হয়। এছাড়া হামের টিকা ৯ থেকে ১২ মাস বয়স পর্যন্ত দেয়া হয়।

২. ২৬ অক্টোবর ১৯৭৭ সালে সোমালিয়ায় সর্বশেষ আক্রান্ত রোগী পাওয়া গিয়েছিলো।

৩. র‍্যাবডোভাইরাসে আক্রান্ত কোন মাংসাশী জন্তু (বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুকুর) মানুষকে কামড়ালে জলাতংক রোগ হয়। এরোগের লক্ষণগুলো হলো: জ্বর, ক্ষতস্থানে অবশভাব, অস্থির লাগা, প্রচন্ড তৃষ্ণা এবং পানি খেতে চাইলেও পানি দেখে আতংকিত হয়ে পানি খেতে না পারা ইত্যাদি।

৪. ক. তলপেটে ব্যথা

খ. মাসিকের সময় বেশি রক্তস্রাব

গ. মাসিক চক্রের মধ্যে ফোঁটাফোঁটা রক্তপাত

ঘ. জরায়ু মোচড়ানোজনিত ব্যথা

ঙ. অস্বস্তিকর স্রাব

৫. আমলকী, কমলালেবু, পেয়ারা, শশা ও টমেটো

(স্বাস্থ্য কুইজ-১১ এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেন নি)

স্বাস্থ্য কুইজ-১২

১. প্রসবোত্তর মায়েরা কয়দিনের মধ্যে দুধ-জ্বরে আক্রান্ত হন? কোন্ ধরনের মায়েরা এই জ্বরে বেশি আক্রান্ত হন?

২. ফিজিওলজিক্যাল জন্ডিস কাকে বলে? আক্রান্ত রোগীকে কি ধরনের সেবা দিতে হয়? কয়দিনের মধ্যে এই রোগের উপশম হয়?

৩. শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি হচ্ছে কি না তা জানার কী কী উপায় আছে?

৪. ডায়রিয়া রোগীর তাপমাত্রা ও নাড়ীর গতি কিভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে?

৫. দু'সন্তানের জননীর জন্য আদর্শ পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি কোনটি এবং কেন?

(উত্তর আমাদের কাছে ১৪ জুন ১৯৯৫ তারিখের আগেই পৌঁছাতে হবে)

জেনে রাখা ভাল

১. দুর্ঘটনাজনিত রক্তক্ষরণে করণীয়

দুর্ঘটনায় যেকোনো সময় শরীরের যেকোনো স্থান গভীরভাবে কেটে গিয়ে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। এভাবে ধমনী বা শিরা কেটে বা ছিড়ে গিয়ে প্রচুর রক্তপাত হতে পারে। ধমনী কেটে গেলে রক্ত ফিনকি দিয়ে ছুটে, আর শিরা কেটে গেলে রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। ধমনী বা শিরা যাই কাটুক না কেন অত্যধিক রক্তক্ষরণে রোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে যেতে পারে। এমনকি ঠিক সময়ে চিকিৎসা না পেলে অত্যধিক রক্তক্ষরণে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। গভীর ক্ষতের আর একটি খারাপ দিক হলো জীবাণু সংক্রমণ বা ইন্‌ফেকশনের ভয়। এ দু'টো কারণে রোগীকে শীঘ্রই নিকটস্থ হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

হাসপাতালে নেয়ার পূর্বে বা স্থানান্তরের সময়ে প্রাথমিক কাজ হচ্ছে রক্তপাত বন্ধ করতে বা কমাতে সাহায্য করা। এজন্যে আপনার যা করণীয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

- কাটাস্থলে এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় বা গজ রেখে সে-স্থান সরাসরি চেপে রাখুন যতক্ষণ না রক্ত বন্ধ হয় বা রক্তপাত কমে যায়। যদি কাটাস্থানের দু'ধার অনেকখানি ফাঁক হয়ে থাকে তাহলে দু'ধার একত্রে চেপে ধরে থাকুন।
- কাটা যদি হাত বা পায়ে হয়, তাহলে সেই হাত বা পা উঁচু করে ধরে থাকুন বা উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন।
- এরপর পরিষ্কার কাপড় বা গজ দিয়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ করে দিন। লক্ষ্য রাখতে হবে, ব্যান্ডেজ যাতে এমন শক্ত না হয় যে রক্ত চলাচল একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।
- আহত স্থানের নড়াচড়া বন্ধের ব্যবস্থা করুন।
- যদি রক্তপাত হতেই থাকে কাপড়ের টুকরো বা গজ পেঁচিয়ে দিন। কোনো অবস্থাতেই প্রথম ব্যান্ডেজটি খুলবেন না।
- সরাসরি চাপ প্রয়োগে যদি রক্তপাত বন্ধ না হয়, সেক্ষেত্রে কাটাস্থান থেকে উপরে (শুধু হাত এবং পায়ের কাটায় প্রযোজ্য) একটি চওড়া কাপড়ের ফালি বা গামছা দিয়ে বেঁধে দিন। খুব শক্তভাবে বাঁধবেন না এবং কোনো অবস্থাতেই এই বাঁধন ১৫ মিনিটের বেশি রাখবেন না।
- অনেকে অবশ্য এভাবে বাঁধার বিপক্ষে বলেন। তাঁদের মতে সংশ্লিষ্ট ধমনী হাতের আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিয়ে রক্ত প্রবাহ কমানো উচিত এবং এক্ষেত্রেও চাপ ১৫ মিনিটের বেশি রাখা যাবে না।
- রোগীকে স্থানান্তরের সময় রোগীর নাড়ীর গতি লক্ষ্য রাখুন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে পৌছানোর ব্যবস্থা করুন।
- ক্ষতস্থানে কখনই গোবর, মাটি ইত্যাদি লাগাবেন না। এতে ধনুষ্টংকারের সম্ভাবনা থাকে।

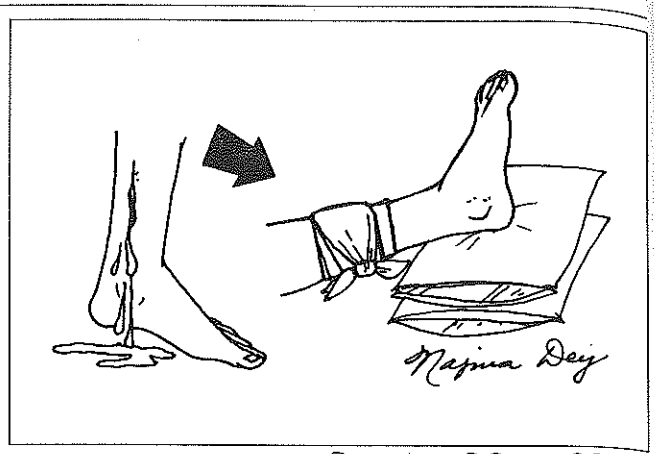

- প্রয়োজনবোধে এবং ক্ষতের গভীরতার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসক হয়তো কাটাস্থান সেলাই করে দিতে পারেন।
- ধনুষ্টংকার প্রতিরোধের ইঞ্জেকশন গত ৫ বছরের মধ্যে নিয়েছে কি না তা রোগীর মনে রাখতে হবে এবং তা চিকিৎসককে জানাতে হবে।

২. উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের জ্ঞাতব্য

করণীয়

১. শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করেন
২. নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করাবেন (কমপক্ষে মাসে ১ বার)
৩. নিয়মিত ঔষধ খাবেন
৪. সপ্তাহে ১ দিন পূর্ণ বিশ্রাম নেবেন
৫. প্রত্যহ কিছুক্ষণ হাঁটার অভ্যাস করবেন

(৬ষ্ঠ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ অধ্যাপক ডেমিসি হাবতে; **সম্পাদক ঃ** ডাঃ ফকির আঞ্জুমান আরা; **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ঃ** এম. শামসুল ইসলাম খান; **কনসালটেন্ট এডিটর ঃ** ডাঃ মোড়ল নজরুল ইসলাম; **সদস্য ঃ** ইউসুফ হাসান, মুজিবর রহমান, ডাঃ তানজিনা মির্জা; ডাঃ শামীম এ. খান ও ডাঃ অমল কুমার মিত্র; **ডিজাইন ঃ** আসেম আনসারী; **প্রকাশক ঃ** আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি), জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০

ফোন ঃ ৬০০১৭১-৮; ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৮৩১১৬; টেলেক্স ঃ ৬৭৫৬১২ আইসিডিডি বিজে

মুদ্রণে ব্র্যাক প্রিন্টার্স ঢাকা বাংলাদেশ